সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যময় জীবন

রোজ অ্যাডেনিয়াম

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিংবদন্তি নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। গুণী এই মানুষটি পৃথিবীর বুকে এসেছিলেন জানুয়ারি মাসে। সারা জীবন কাজ করে গেছেন দেশের জন্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের তালিকায় প্রথম সারিতেই পাওয়া যায় তার নাম। 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' এটি তার সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তি। তিনি ছিলেন একজন বীর, দেশপ্রেমিক, প্রতিবাদি, স্নেহ পরায়ণ ও দয়ালু মনের মানুষ। ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা একটি শ্রোতা জরিপ করে। এ আয়োজনে শ্রোতাদের মনোনীত শীর্ষ ২০ বাঙালির তালিকায় পঞ্চম স্থানে ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু।

সুভাষের জন্ম ও পরিবার

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উড়িষ্যার কটক শহরে ১৮৯৭ সালে ২৩ জানুয়ারি বিখ্যাত 'বসু পরিবারে' জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনকীনাথ বসু ছিলেন একজন ভারতীয় আইনজীবী। সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী ছিলেন সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯২৮ সালে মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মা-বাবার এই স্বাধীনতা সংগ্রামী আদর্শ পান তাদের দুই পুত্র সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তার মা-বাবার চোদ্দতম সন্তানের মধ্যে নবম সন্তান ও ষষ্ঠতম পুত্র সন্তান।

নেতাজির ছেলেবেলা

সুভাষচন্দ্র বসুকে তার ভক্তরা ভালোবেসে নেতাজি বলে ডাকেন। ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র সুভাষ সব কাজেই বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। সব বিষয়ে ছিলেন বেশ কৌতূহলী। আর ছেলেবেলা থেকেই প্রতিবাদি ছিলেন যা সুভাষচন্দ্র বসুকে বানায় 'দেশনায়ক'।

শিক্ষাজীবন ও চাকরি

সুভাষ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন কটক শহরে। প্রথমে স্টুয়ার্ট হাইস্কুলে, পরে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে। স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন বেণীমাধব দাস, যার প্রভাব সুভাষ বসুর জীবনে খুব বেশি পড়েছিল। স্কুলজীবনে সুভাষের ওপর বড়ধরনের প্রভাব ফেলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মেধাবী ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করার পর ভর্তি হন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিন্তু ওই কলেজ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক প্রফেসর ওটেনকে ছাত্ররা প্রহার করেছিল তার ভারতবিরোধী মন্তব্যের জন্য। সে ঘটনায় সংশ্লিষ্টতার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সুভাষ বসুকে বহিষ্কৃত হতে হয়। পরে তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে স্নাতক পাস করেন।

সুভাষ বসু ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিৎসউইলিয়াম হল থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে পাস করেও তিনি ব্রিটিশদের অধীনে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নেন। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও কোনো বিদেশি সরকারের অধীনে কাজ করতে চাননি তিনি। নিয়োগপত্র পাওয়ার পরই তিনি সেই কাজে ইস্তফা দেন ১৯২১ সালে এবং ফিরে যান ভারতে। চাকরির লোভনীয় পদ তিনি পরিত্যাগ করেন দেশের স্বার্থে।

স্বাধীনতার আন্দোলনে সুভাষ বসু

দেশে ফিরে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্র বসু যোগ দেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি হবার পর পরপর দুবার তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও নির্বাচিত হন। 'স্বরাজ' নামে একটি সংবাদপত্র শুরু করেন তিনি। ভারতে ফিরে যাবার পর এবং বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশগ্রহণের কারণে অনেকবার তাকে জেল খাটতে হয়েছিল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে আদর্শগত পার্থক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন সুভাষচন্দ্র। অনেকেই মনে করেন সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি গান্ধী সেইসময় অবিচার করেছিলেন।

ইউরোপে পাড়ি ও বই প্রকাশ

উনিশশ তিরিশের দশকে সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপে পাড়ি জমান, যে সফরে তিনি ইটালির নেতা বেনিতো মুসোলিনি সহ বেশ কিছু ইউরোপীয় নেতার সঙ্গে দেখা করেন। এই সময় তিনি লেখেন 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' নামে তার বইয়ের প্রথম পর্ব। এই বইয়ে তিনি তুলে ধরেছিলেন ১৯২০ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত ভারতে স্বাধীনতা

সংগ্রামের কথা। বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হলেও ব্রিটিশ সরকার বইটি ভারতীয় উপমহাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা অন্যধারার প্রবক্তা সুভাষচন্দ্র বসু শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না কলকাতা পৌরসভার মেয়র থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সবক্ষেত্রেই তিনি কম বয়সে তার নিজস্ব চিন্তাধারার প্রমাণ রেখেছিলেন। কলকাতায় এলগিন রোডে তাদের পারিবারিক বাড়ির শোবার ঘর থেকে ১৯৪১ সালে শীতের এক রাতে তার পালিয়ে যাবার ঘটনাটা ছিল ঐতিহাসিক। বিশেষভাবে প্রহরায় ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেখান থেকে ট্রেনে উঠে তিনি চলে যান পেশাওয়ার। পেশাওয়ার থেকে কাবুল, কাবুল থেকে মস্কো হয়ে পৌছান জার্মানিতে। সেখানে গিয়ে তিনি প্রথম শুরু করেন তার আজাদ হিন্দ আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র বসু থেকে তার যে 'নেতাজি'তে উত্তরণ, সেটার প্রথম ধাপ শুরু হয়েছিল কলকাতায় এলগিন রোডের বাড়ি থেকে পালানোর পর।

রাষ্ট্রপ্রধান ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সুপ্রিম কমান্ডার

পরে জার্মানি থেকে সাবমেরিনে করে তিনি পৌছান জাপানে। তারপর সিঙ্গাপুরে গিয়ে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার। ইতিহাস বলছে, সেটাই ছিল ভারতের বাইরে দেশটির প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন সরকার। সুভাষ বসু হলেন সেই সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ৪৫ হাজার ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা আত্মীকরণ করলেন। তাদের নিয়ে গঠিত হল ভারতের মুক্তি বাহিনী - ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি (আইএনএ)। তিনি হলেন তার সুপ্রিম কমান্ডার। তার আহ্বান ছিল 'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে তিনি লুকিয়ে ভারত ত্যাগ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি ও জাপান ভ্রমণ করেছিলেন ভারতে ব্রিটিশদের আক্রমণ করার জন্য সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নাৎসি জার্মানি ও জাপানের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্রের সমালোচনা করেছিলেন। এমনকি কেউ কেউ তাকে নাৎসি মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলেও অভিযুক্ত করেছিলেন। তবে অন্যদিকে এমন যুক্তিও ছিল যে জার্মানি আর জাপানের সঙ্গে হাত মেলানোর সিদ্ধান্ত তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থকরা বলেছেন এ কথা মানতেই হবে যে জার্মানি আর জাপানই ছিল তার কাছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র ভরসার স্থল। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে করে হোক ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত করা। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, কবে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের স্বাধীনতার অনুমোদন দেবে তার জন্য বসে না-থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে সুবিধা নেওয়া উচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নির্ভর করে অন্য

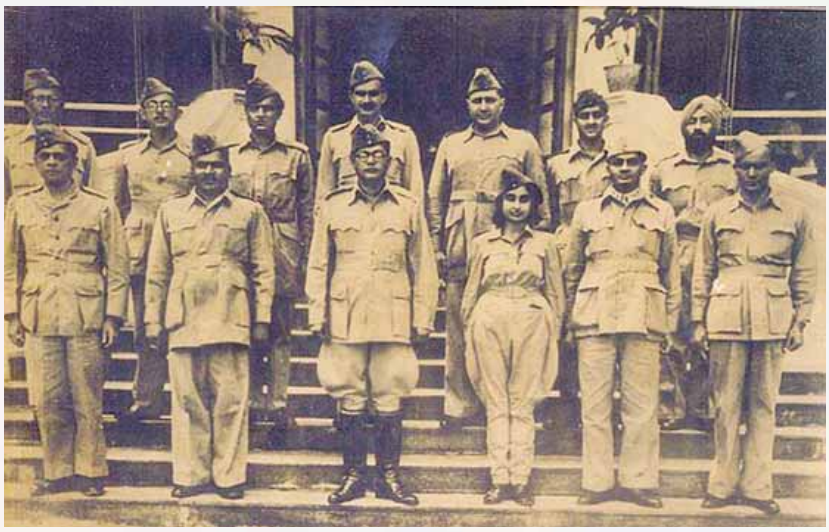

দেশের রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সমর্থনের উপর। আর তাই তিনি ভারতের জন্য একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

হিটলারের সঙ্গে দেখা

১৯৪২ সালে জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। ঐতিহাসিকদের মতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও অসংখ্য ভারতীয়ের চোখে তিনি আজও বীর বাঙালি যোদ্ধা, এখনও 'নেতাজি'।

সুভাষচন্দ্র বসুর সংসার

১৯৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এমিলি শেংকল-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ভিয়েনাতে। এরপর ১৯৩৭ সালে তারা বিবাহ সম্পন্ন করেন। তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ২৯ নভেম্বর ১৯৪২ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে। কন্যার নাম অনিতা বসু পাফ। তিনি জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির রাজনীতিবিদ।

চলচ্চিত্রে সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী অবলম্বনে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে 'সুভাষচন্দ্র' (১৯৬৬), 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু: দ্যা ফরগটেন হির' (২০০৪), 'গুমনামি' (২০১৯), 'দ্য ফরগটেন আর্মি' (২০২০)। এছাড়া বোস ড্যাড/অ্যালিভ (২০১৭) নামে একটি টিভি সিরিজ হয়েছে সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে। এই সিরিজের নয়টি পর্ব। সিরিজটিতে নেতাজির মৃত্যু রহস্যও তুলে ধরা হয়েছে। একতা কাপুরের পরিচালনায় সিরিজটিতে সুভাষের চরিত্রে অভিনয় করেন রাজ কুমার রাও।

সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু রহস্য

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুর ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক আছে। ঐতিহাসিক লিওনার্ড এ গর্ডনের লিখিত তথ্য অনুযায়ী, তাইপেইর তাইহোকু বিমানবন্দরে একটি বিমান দুর্ঘটনায় শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল সুভাষচন্দ্রের। থার্ড ডিগ্রি বার্ন নিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। সম্প্রতি শাহওয়াজ কমিশন এবং খোলসা কমিশনের রিপোর্টকেই মান্যতা দিয়ে মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৯৪৫ সালে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র চন্দ্রকুমার রায় এই তথ্য মানতে চান না। তিনি বলেন, জাপান সরকার মোট ৫টি ফাইল পেয়েছিল তার মধ্যে ২টি ফাইল প্রকাশ করেছে তারা। বাকি ৩টি এখনও সামনে আসেনি। মুখার্জি কমিশনের বিচারপতি মনোজ মুখার্জির রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালে কোনো বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি নেতাজির। তাইওয়ান সরকার মুখার্জি কমিশনকে একটি চিঠিতে জানান, ১৯৪৫ সালে ১৮ আগস্ট তো নয়ই তার আগে বা পরে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। প্যারিসের 'ইনস্টিটিউট দে হতে এতুদে ইকনমিকস এত কমার্শিয়েলস'-এর অধ্যাপক ঐতিহাসিক জে বি পি মোরে দাবি করেছেন, ১৯৪৫ সালে নেতাজির তাইহোকুর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি বরং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। ছাড়াও ফরাসি গোয়েন্দা রিপোর্টেও এই তথ্য উঠে আসে। ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরেও তিনি জীবিত এবং ফরাসি গোয়েন্দা রিপোর্টে স্পষ্ঠভাবে বলা হয়েছে যে সুভাষচন্দ্র ছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের জাপানি সংযোগকারী সংগঠন তথা হিকারি কিকানের সদস্য। এছাড়াও আরো একটি মত উঠে আসে ফয়জাবাদের 'ভগবানজি' গুমনামি বাবা ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই গুমনামি বাবার মৃত্যু হয় ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। মুখার্জি কমিশনের মতে, গুমনামি বাবার সাথে নেতাজির পরিবারের যোগাযোগ ছিল। গুমনামি বাবা দেখতে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মতোই। তবে এই গুমনামি বাবা সকলের সামনে কখনোই আসেননি। এভাবেই এখনো রহস্যে ঘেরা নেতাজির মৃত্যু। সশরীরে না থাকলেও সবার কাছে শ্রদ্ধার মানুষ হয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন নেতাজি।